Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 176
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 164 - 176
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

নলিনী বেরার কথাসাহিত্যে প্রান্তিক মানুষের ভাষা

সহেলী বিশ্বাস
গবেষক, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sahelirbu@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025
Selection Date 20. 07. 2025

Keyword
Folk Culture, Marginal, Regional, Nalini Bera, subaltern.

Abstract
Life with its vast expanse often becomes too overwhelming for human expression. Hence, we the petty beings resort to the ever popular trend to compartment-talise and category's life into various classes of people based on social structure or living standards - higher class (elite/ aristocrat), middle class and the marginalized or lower class. The marginalized or the lower class of people are also referred to as the 'masses', the 'common man' or 'working class'.

The stories we read in our novels, novellas or short stories are stories of people. However, we tend to divide people as well, for the ease of discussion. The fictional prose of the '70s moves out of the urban landscape to the rustic pioneered by the likes of Mahasweta Devi & Prafulla Roy. Nalini Bera being a rustic man himself chooses his own life as an inspiration for all his writings. His literary universe is decorated by his life, it's various ebb and flow like the course of Subarnarekha. His language is the language of his people, simple and pure like the clear stream of Subarnarekha. This is the language we often refer to as 'folk'.

'Folk' here refers to people. The people classified as rustic or 'Vulgar'. All the people belonging to the working class the proletariat are referred to as 'Folk' and their culture as 'Folk Culture'. The people associated with this culture are the working class Hence, we may say "folk Culture' is actually the culture of the "Subaltern" & their language is the one in which the 'Subaltern Speaks Therefor, the culture would be reduced to a void, dissociate the people from this culture.

This culture is representative of the life and living of the subaltern. This culture is a flowing stream of knowledge that has undergrow a matter Slow change.

Nalini Bera being a man of his culture has provided us well curated pictographic representation of his people residing our the banks of the Subaruarekha. He has captured of their culture in its totality - language, religion, culture, superstiticon to paint a wild, yet vivid image his people in his writtings. He represents this life with both, distouched objectivity and immersive subjectivity, captured beautifully in all his nuanced character While

doing so he has used the language as a instrument of his craft, transcending it to become a seperate and individualized character of his narrative.

Discussion

ভাষাকে ভাবের বাহন রূপেই জেনে এসেছি আমরা। প্রান্তিক জনজীবনের ভাষ্যকার নলিনী বেরা সুবর্ণরেখা নদীর দক্ষিণ তটবর্তী নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর থানা তৎসন্নিহিত তপোবন জঙ্গলমহল, সেখানকার মানুষজন ও তাদের ভাষাকেই তিনি তুলে ধরেছেন কথাসাহিত্যে। দেখতে গেলে একটা এলাকার মানুষের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেছেন। ভাষা প্রসঙ্গ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক মানুষগুলির রীতিনীতি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, লোকাচার, বিশ্বাস, কুসংস্কার স্থানীয় দেবদেবী নানাভাবে উপস্থিত হয়। এই মানুষগুলি সামগ্রিক জীবনের চিত্র বা Total Life অঙ্কনের জন্য আবশ্যকভাবেই এই প্রসঙ্গগুলি এসে যায়, যেতে বাধ্য। পদ্মফুল ফ্ল্যাটের ড্রয়িং রুমে শোভা পায় ঠিকই কিন্তু তা খণ্ডচিত্র। সামগ্রিক চিত্র তথা শেকড়ের সন্ধান করতে গেলে আমাদের ওই কাঁদায় যেতেই হয়, না হলে ওই চিত্রমালায় একটা ফাঁক থেকে যায়। প্রসঙ্গত বলতে হয় 'নলিনী বেরার কথাসাহিত্যে প্রান্তিক মানুষের ভাষা' প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলে আমাদের প্রথমেই যে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে -

লেখক যে অঞ্চলের বিবরণ দিয়েছেন বা কথাসাহিত্যে প্রান্তিক মানুষরূপে যাদের আখ্যায়িত করা হয়েছে তাদের ভাষার পূর্বে 'লোক' শব্দটি প্রযোজ্য। তাদের সংস্কৃতির পূর্বে 'লোক' শব্দটি প্রযুক্ত হলে বিষয়টি লোকসংস্কৃতির হয়ে ওঠে, সেক্ষেত্রে আমাদের বিষয় আলোচনার সময় লোকসংস্কৃতির প্রসঙ্গ এসে পড়ে।

জীবন জীবনই, তবুও পথ চলতি হওয়ায় গা-ভাসিয়ে আমরা ভাগ করে নিই উচ্চবৃত্ত জীবন, নিম্নবৃত্ত জীবন, প্রান্তিক জীবন। আসলে জীবনের এমন বড় ব্যাপ্তি, তার সামগ্রিক ছবি তুলে ধরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তেমনি সমস্তকে খন্ড করে দেখাও আমাদের স্বভাব। এটাও ঠিক গল্প-উপন্যাসে বলা হয় মানুষের কথা। সে মানুষের আবার ভাগ কী? তবুও আলোচনার সুবিধার্থে আমরা নানা ভাগে ভাগ করে নিই। মহাশ্বেতা দেবী থেকে প্রফুল্ল রায় সকলেই ডাক দিয়েছেন নগর থেকে গ্রামে বেরিয়ে পড়ার। সত্তর পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্য এভাবেই নগরকেন্দ্রিকতা থেকে বেরিয়ে গ্রামজীবন কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। নলিনী বেরা তো গ্রামেরই মানুষ তাই আখ্যান নির্মাণের জন্য বেছে নিয়েছেন নিজেরই যাপিত জীবনকে অর্থাৎ সেই গ্রাম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলকে। ভাষা রূপে ব্যবহার করেছেন ওই অঞ্চলের মানুষের মৌখিক ভাষাকে। সুবর্ণরেখা যেমন বারবার নিজের গতিপথ পরিবর্তন করে বাঁক নিয়েছে তেমনি এখানকার মানুষের জীবন ও আঁকাবাঁকা বাঁকময়। সেই বাঁকের কোথাও আছে চড়াই কোথাও উৎরাই। এসব নিয়েই তাদের জীবন। কিন্তু তাদের ভাষা সুবর্ণরেখার জলের মতোই স্বচ্ছ সহজ।

লেখক সেই ভাষাকেই তার কথাসাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। এই ভাষার পূর্বে 'লোক' শব্দ যুক্ত করলে তা হয় 'লোকভাষা'। এদের সংস্কৃতির পূর্বে 'লোক' শব্দ প্রযুক্ত হলে তা হয় 'লোকসংস্কৃতি'। 'Folk' শব্দের অর্থ বাংলা 'লোক'। এই লোক অর্থে সমাজের প্রতি সাধারণ স্তরের জনমণ্ডলীকে বোঝায় আর দেখতে গেলে ভারতের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ মানুষই তাই। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় ভাষায় 'লোক' শব্দের অর্থসীমা অত্যন্ত ব্যাপক। বেদে 'লোক' শব্দের মূল অর্থ ইন্দ্রলোক। শাস্ত্র, পুরাণ ও কাব্যে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল (ভূ ভূর্বঃ স্বঃ) – এককথায় ত্রিলোক পুরানে সাত ঊর্ধলোক ও সাত অধঃলোক মিলিয়ে চতুর্দশ লোকের কথা আছে। 'লোক' শব্দের অন্যান্য ব্যবহারের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে জন অধ্যুষিত বিশ্ব (ভুবন)। রামায়ণ, মহাভারত এবং তদ-অনুসারে অমরকোষ টিকায় এই অর্থে 'লোক' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। প্রকৃতি তথা প্রজা থেকে জন, মনুষ্য অর্থ এসেছিল। পরে তা সাধারণ জন এবং তার সদৃশ অন্যান্য গৌণ অর্থ যেমন জন, ভৃত্য, কর্মী, মজুর, সাথী, অনুচর, অধিবাসী, সেনা ইত্যাদি অর্থে স্বীকৃত। আধুনিক যুগে 'লোক' এর মূল প্রয়োগ অন্তত বাংলা ভাষায় সাধারণ জন অর্থে স্থায়ী হয়েছে।

'Folk' শব্দের অর্থ এখানে শুধু মানুষ। লোক বা জনগণ নয়, বিশেষ অর্থে তারা Vulgar বা গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। উচ্চবর্ণ ও অভিজাত বর্গের বাইরে নিতান্ত খেটে খাওয়া মানুষরাই Folk আর এই সংস্কৃতি বা folk culture - এর সঙ্গে যুক্ত জনগণও খেটে খাওয়া নিচুতলার বাসিন্দা সুতরাং এ কথা বলতেই পারি Folk Culture আসলে Subaltern দের

কালচার এবং তারই একটি অংশ 'লোকভাষা'। সেই অর্থে দেখতে গেলে 'লোক'-কে বাদ দিলে সংস্কৃতির আর কিছুই থাকে না। লোকসংস্কৃতি আসলে হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা জীবন প্রবাহ। যার পরিবর্তন অতি ধীরগতিতে ঘটেছে। কথা সাহিত্যিক নলিনী বেরা এই মানুষেরই একজন আর তাই এই সুবর্ণরেখার তীরবর্তী তপোবন জঙ্গলমহলের প্রান্তিক মানুষদেরকে তিনি যেভাবে দেখেছেন ঠিক সেইভাবেই নিপুন দক্ষতায় সাহিত্যে চিত্রায়ন করেছেন। কথাসাহিত্যিক যে মানুষগুলিকে নিয়ে লিখেছেন সে মানুষগুলি এই লোক জীবনের অন্তর্গত তাদের সেখানকার ভাষা, অভ্যাস, রীতিনীতি পালাপার্বণ, বিশ্বাস, সংস্কার, উৎসব, অনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ সবই আছে। এই জীবনকে তিনি যেভাবে দেখেছেন সেভাবেই নির্মাণ করেছেন। লেখকের একটি সুবিধার জায়গা যে তিনি এই সমাজের বা ওই জনজাতির একজন। এই জীবনকে তিনি যেমন নিরাসক্ত ভাবে দেখেছেন তেমনি নিজেও চরিত্রের গভীরে ঢুকে গেছেন লোকোভাষার নানান উপাদানগুলি তিনি নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং উপন্যাস ও গল্পসাহিত্যে নব আঙ্গিকে তা ফুঁটিয়ে তুলেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তার খণ্ডাংশ আলোচনা করা হয়েছে।

লোকভাষা : ভাষা এমন একটা অবলম্বন যা প্রান্তিক মানুষদেরকে অন্যান্যদের থেকে পৃথক করেছে। তারা সাঁওতাল, হাঁটুয়া (বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার মিশ্রন) ভাষায় কথা বলে। যার সঙ্গে রয়েছে সাধারণনের ভাষার বিপুল পার্থক্য। তাদের এই ভাষা শুধুমাত্র কয়েকটি শব্দের সম্মিলিত সংগঠন নয়, এই ভাষা একটি বিশেষ পরিমণ্ডলের ভূ-প্রকৃতি, জনবিন্যাস, জীবনচর্চার সম্মিলিত উচ্চারণ। এই ভাষার প্রতি সাহিত্যিকের গভীর দরদ রয়েছে তা তার উপস্থাপন রীতি ও প্রকাশভঙ্গিতেই বোঝা যায়। এ ভাষা প্রকৃতির মতোই প্রাকৃতিক। নির্দিষ্ট কোন ব্যাকরণের বিধি নিষেধ নেই।

> "ভাষাবিজ্ঞানীদের অনুসরণে তিনটি স্তর বিভাজনের উল্লেখ করা হয়েছে।
> ১। শিষ্ট ভাষা (cultivated speech) - অভিজাত ব্যবহারকারীদের অভিপ্রায় অনুযায়ী গ্রাহ্য হয়।
> ২। জন ভাষা (common speech) - সাধারণ মৌখিক ব্যবহার বা কথ্য ভাষার স্তর।
> ৩। লোক ভাষা (Folk speech) - যা বিশেষ সামাজিক স্তরের ভাষা ব্যবহারের স্তর।
> এই স্তরবিন্যাসের শেষটি ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পরেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন 'লোকভাষা হল বিভিন্ন কারণে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও কৌমজনের ভাষা- যা নানা কারণেই ক্রমক্ষয়িষ্ণু।'"[১]

নলিনী বেরা কথাসাহিত্যে যে জনজীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন তারা লোকভাষাতেই কথা বলে। নলিনী বেরার অন্যতম উপন্যাস 'ফুলকুসমা' (১৯৯৬)। এই উপন্যাসে ডাকপিয়ন পরিতোষকে বলতে শোনা যায় –

> "দেখো গিয়ে কলকাতায় কোন মাগের পিছনে টাকা ঢালছে লেবারন।"[২]

'মাগ' অর্থাৎ 'মহিলা' অর্থে শব্দটি এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে। আবার এই উপন্যাসেরই চরিত্র ঈশ্বর বেহেরার মত মানুষকে 'খেচাকল' বিক্রি করতে দেখা যায়। 'খেচাকল' শব্দটি এখানে 'গ্যাস লাইটার' অর্থে প্রযুক্ত। এই উপন্যাসে এমন কিছু শব্দের সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের ভাষা ছাঁদ, যেমন - 'পাছড়ানো' - কুলোর মধ্যে ঝাড়া, 'ভরা' - নৌকো করে যাওয়া, 'টাঁড় - টিঁকর' - যে মাঠে চাষ হয় না, পাথুরে রূপ যার। আবার বেশ কিছু ফলের লোক প্রচলিত রূপ এখানে রয়েছে। যেমন – প্রিয়ঙ্গু (আমলকী), সর্ষপ(সরিষা), লবনী(লবঙ্গ), পর্ণক(পাতা)।

'মাটির মৃদঙ্গ' (২০১৭) উপন্যাসেও ঘুরে ফিরে এসেছে প্রভূত লোকভাষা, যে লোকভাষা গভীর দৃষ্টি দিয়ে অনুধাবন করলে একটি গোষ্ঠীর মানুষের ভাষারূপকে চিহ্নিত করে। যেমন - 'আথোল' - বড় গামলা, 'ভেঁইচা' - হাঁড়ি কলসির কাঁচা আদল, 'পোআনশালা' - মাটির হাঁড়ি-কলসি আগুনে পোড়াবার স্থান, 'মাটিখানা বা খুলিগুহা' - মাটির কারখানা, 'বারসি' - ছোট কোদাল', 'কুঁদা' - গুঁড় রাখার কলসি, 'সাজা'- ধান কাটার বিনিময়ে জমি খাজনা নেওয়া, 'গাড়ু' - একপ্রকার পাত্র বিশেষ।

এছাড়াও রয়েছে লোকমানসের আপন কণ্ঠস্বর। যেমন - 'দিঙ দিঙ' করে 'চাউর' হয়ে যাওয়া, 'খুপ খুপ' আওয়াজ, 'খ্যা খ্যা' হাসি বা 'আটবন্ধন', 'বাটবন্ধন', 'আশ পালনা', 'অসব্য', 'লুড়কি' ইত্যাদি। আবার মহিলা-পুরুষের নিবিড় সম্পর্ক

বা গর্ভবতী হওয়া প্রসঙ্গে নানান লোকজ শব্দের প্রয়োগ রয়েছে। যেমন - 'জাঁকামাড়া' অর্থাৎ সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া, 'গিদরৌ' (ভ্রূণ), 'হিক্কা' (বমি), 'চেঁকা' (টক), 'আঁকুর' (গর্ভবতী হওয়া)।

'সুবর্ণরেনু সুবর্ণরেখা' উপন্যাসে জল-জঙ্গল-পাহাড়-নদী-খালবিল ঘেরা প্রকৃতির সুনিবিড় মুক্তাঙ্গনে রয়েছে লোকভাষার একরাশ তাজা হওয়া। এই উপন্যাসে সাঁওতাল, ভূঁইয়া, ভুমিজ, লোধা, কামহার, কুমহার, মাহাতো, মাহালী, তাঁতি সবাই লেখকের স্ব-গোত্র। তাই লেখককে ভাষার কারিগরি করতে হয় না। প্রত্যন্ত মানুষের সক্রিয় কথাবার্তায় তার হাতিয়ার হয়েছে। লোকভাষার স্বীয় মেজাজ রক্ষার্থে বহুশব্দ লেখক ব্যবহার করেছেন। যেমন - বাখুল (পরিবার বা গোষ্ঠীর বাড়ি), দেড়াইয়া (সঙ্গম করতে দেওয়া), ডহর (রাস্তা), হিড় (জমির আল), টিকে (একটু), ঠার (সাঁওতালি কথ্য ভাষা), টকা (ছেলে), দক (জলা জায়গা), টকি (সিনেমা), কাকুড় (শশা), গজা (বাঁশ), আলা (ক্লান্ত), নাচুয়া (নর্তকী), গাড়িয়া (ছোট পুকুর), ভুটুম (বাচ্চা), পড়া (পুরুষ মোষ) ক্যাতা (নদীর ধার), লেলহা (বোকা), হুরি (গণ্ডগোল), হুদা (পিতলের আংটা কাম সরকারি সিলমোহর), চুপি (লাউয়ের শক্ত খোসার তরকারি), চুরকা (আলু জাতীয়), মেহা-মাদাল (আতা), মহড়া (মুখোশ) ইত্যাদি। বেশ কিছু লোকভাষার শব্দকে লোকখাদ্য রূপে ও চিহ্নিত করা যায়। যেমন - শাকমুথা, ঘলঘসি, সরস্তি, শুশনি, ঘোরাকানা, নাহাঙ্গা, বনকাল্লা, চ্যাকা, ফল – কাকরো, কুদরি, ভেলা।

নলিনী বেরার লেখা ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস 'অপৌরুষেয়'। এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট কুমোর সম্প্রদায়ের গ্রাম। যেখানে প্রায় শ-দেড়েক হাঁড়ি কলসি গড়ার কারিগরদের বাস। এই কুমোর সম্প্রদায়ের নিজস্ব লোকজ ভাষা উপন্যাসটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। যেমন - গাড়ু-ত্যালান, বতর, পিঁড়োল, পিটনা, ভেঁইচা, গিলা, ডেলা, কুঁদা, ঠেকা, পাছিয়া, বারসি ইত্যাদি।

'

চোদ্দমাদল' উপন্যাসটির কথক স্বয়ং নলিন বাবু। এই এই উপন্যাসের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে লোকজভাষা যা এই উপন্যাসকে পাঠকের দরবারে অন্য মাত্রা দান করেছেন। যেমন - 'ঢ্যাঙুয়ান' (আমুদে লোকজন), 'সুরুবুড়ি' (ছোটমেয়ে), 'কাঁড় - কাঁড়বাশ' (তীর ধনুক), 'পাজানো' (বানানো), 'পরব ছাতু' (প্রাকৃতিক মাশরুম), 'লকশা' (নকশা), 'বারশি' (ছোট কোদাল), 'ঢেন্ডিপালী' (জুয়ার বোড়), 'নেত' (লম্বা লম্বা রঙের কাপড়ের ফালি), 'বাঘযুগনি' - জোনাকি, 'টোঙটি' (হাবিজাবি পাতা দিয়ে ছওয়া)। এসব শব্দ আমাদের মত পাঠকের শব্দ ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে।

লেখক এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'শবর চরিত' (২০০৫)। উপন্যাসের প্রাণ-এর ভাষার ব্যবহার। চরিত্রের মুখের ভাষার ব্যবহার। লোকজ ভাষা মানেই সংযোগের সংকট কারণ তথাকথিত সুশিক্ষিত মানুষ তাদের ড্রয়িং রুমে বসে যে ভাষায় কথা বলে তার সাথে এই ভাষার বিস্তর ফারাক। তাই প্রান্তিক মানুষেরা তাদের লোকজ ভাষাগত কারণে সু-শিক্ষিত সমাজের থেকে বিচ্ছিন্ন ফলত সংযোগের মাধ্যম যে ভাষা তার জন্যই একটা সংকটের সম্মুখীন হতে হয় তাদের। সেই সংকটের কারনেই অস্তিত্বের লড়াই জারি রাখতে হয় তাদের। সেই অস্তিত্বের লড়াই নিজের উপন্যাস জুড়ে জারি রেখেছেন লোকজ ভাষা ব্যবহার করেই। কোথাও থামতে দেননি তিনি। যেমন - চুটিয়া (ইঁদুর), গইঠা (ঘুটে, গোবিষ্ঠা), টেপচু (ফিঙে), অটঙগা (ধান ঝাড়ার পর খড়), বিহান (ধানের চারা), কাকর জল (শিশির), অড়গাঁ ধরা - (ছেলে ধরা), ভুরখা ইপিল (শুকতারা), সেরেঙ (গীত), মারাক (ময়ূর পুচ্ছ), বতর (ভিজে ভিজে), বরহই দড়ি (পাটের দড়ি), ভুগড়া (কুড়ে), ন্যাংটা ভুটুং (উলঙ্গ শিশু), পেঁদ (মিছি মিছি), হহ আলুতুম্বা (ওল) ইত্যাদি।

তাছাড়া লোধা, কামার, কুমোরদের কথ্যভাষা ঝাড়খন্ডি বাংলা, ধল ভূঁইয়া বাংলা। উপন্যাসের যে কোন অংশেই তার নমুনা পাওয়া যায়। যেমন -

"ইবারের মতন বাঁচাতে পারি বক্সা,
তবে এক কড়ারে -
কী কড়ার রাইবু?
বল্, কুনো লব্বা ম্যায়ার সঙে আর কুনোদিনও 'জাঁকামাড়া' করবি নাই?"[৩]

এরপর আসা যাক নলিনী বেরার গল্পে। লেখক এর গল্পে লোকভাষার প্রতুল ব্যবহার ঘটেছে যেমন 'বর্ষামঙ্গল' গল্পের পরমেশ্বরকে আমরা বলতে শুনি 'হলহলিয়া' সাপ অর্থাৎ হেলেসাপ। আবার হলহলিয়া সাপ জড়াজড়ি করে পড়ে থাকলে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 176
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাকে বলে 'গুড়পুটল', নলিনী বেরার গল্পে এমন কিছু লোকশব্দের সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলি একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের ভাষা বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। যেমন - বাখুল - কতগুলি পরিবার একসঙ্গে থাকা, পোহান - মাটির বাসন পোড়াবার স্থান, খাপরা - বাসনপত্র ইত্যাদি। এছাড়া কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন লোকশব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন - বাইদ বহাল, ডাহি ডুঙরি, টাড় - টিকর, বতর, পোঙ, দক ইত্যাদি। আবার এমন কিছু শব্দ আছে যা লোকসমাজের নিজস্ব কণ্ঠস্বর - ডিং ডিং, খুপ খুপ, উঁকি ঝুঁকি, চিড়িক চিড়িক, টিপিক টপিক, উসুর ফুসুর, টিবলি টাবলা। 'ভাদুতলার ভূত ও রুপার নাকছাবি' গল্পে ভাদুতলা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের পরিচয় প্রসঙ্গে কিছু স্থাননাম, মাছ, প্রাণী, খাদ্যবস্তু আঞ্চলিক ভাষার মাধুর্যে রূপ লাভ করেছে। যেমন - ভীম-কটাশ, উদবিড়াল, সোঁতা, সুখজুড়ি, মাঝডুবকা, বগ্গা, হলহলিয়া, ঢোঁড়া সাপ।

আবার 'চিড়কিন ডাঙা' গল্পটির মর্মমূলে অদ্ভুত এক রোমান্স রয়েছে। চিড়কিন ডাঙার সনাতন গুনিনের পুত্র গুড়া মকাই খেত পাহারা দিতে গিয়ে চিড়কিনের সঙ্গে সাঙা করেছিল, সেটাই গল্পের বিস্ময়। এই গল্পে বর্ণিত লোকজশব্দ যেমন – সাঙা, গড়ম, সিঁদুর বাপলা, ব্যকরা থানা, জোড় বোড় (বট অশ্বত্থের সারি), টিস টিস, বাগা ডুলু (ফিন ফিনে ফড়িং), খতখানা (গোবর ফেলার জায়গা), দকা, পটম, জুমড়া, বাসিয়াম, তেড়া। ইত্যাদি।

'ডারউইনের কান্না' গল্পের ডারউইন হলেন স্বয়ং লেখক নলিনী বেরা। কিশোর বয়সের স্মৃতি রোমন্থিত হয়েছে এ গল্পে। এ গল্পে রয়েছে অজস্র লোকশব্দ। যেমন - বাঁকড়া, ন্যাংটা ভুটুং, লেটো (মকাই বীজ সেদ্ধ), পাল বেগুন আখুবিল, গজলদারি। কিশোর বয়সের অভিজ্ঞতা লেখক নলিনের রোমান্টিক সত্তা ও লোকভাষার চমৎকারিত্ব পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আসলে লোক ভাষার গোষ্ঠী অনুভব (Community feeling) যতটা ভাষিক ঐক্য গড়ে তোলে তার চেয়ে বেশি গড়ে তোলে সামাজিক ঐক্য। সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে লোক ভাষার Unit ভাষাগত নয়, তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমাজগত হয়ে উঠেছে। এছাড়া লোকভাষার অবস্থান ও মর্যাদা যে মূল্যের হোক না কেন ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় তার স্থান আমাদের স্বীকার করতেই হয়। লোকভাষার ঐতিহ্যবাহিতা। কিন্তু এর পরিবর্তনও খুব স্বচ্ছন্দে চলে। যেটিও লেখকের লেখনীতে ফুটে উঠেছে। লোকো ভাষার মুখ্য আলোচ্য বিষয় বাক রীতি এবং শব্দভাণ্ডার যা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। লোকো ভাষার রূপ ও ব্যাপ্তি যে এক বিন্দুতে নিশ্চল থাকে না তা কথাসাহিত্যিকের লেখনীতেই ধরা পড়েছে।

লোকভাষার অবস্থান মানচিত্র নিম্নরূপ -

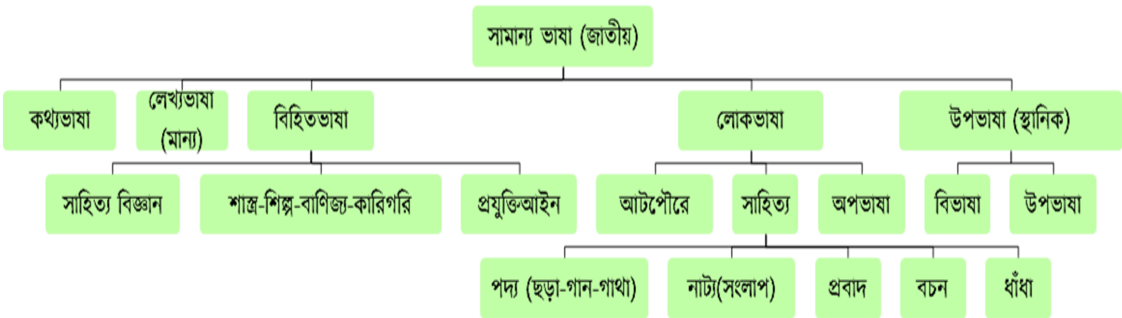

ছড়া : লৌকিক পদ্যকে সাধারণত ছড়া বলা হয়। এই জাতীয় পদ্যগুলি মামুলি ছন্দে সংক্ষিপ্ত আকারে লোকমুখে উচ্চারিত হয়। লোকজ জীবনের খন্ড খন্ড অভিজ্ঞতার মিলিত স্বীকৃতি ধারণ করে ছড়া। যেকোনো বয়সী বিষয় নির্বিশেষে ছড়া সৃষ্টি ও আবৃত্তি করতে পারে। জীবন বৃত্তের আদ্যন্ত প্রকাশ পায় ছড়ায়। পালনীয় প্রথা, আচার-বিচার, বিশ্বাস সংস্কার, ন্যায় নীতি, ধর্ম, সমাজ, জীবিকা, মনোরঞ্জন বিজ্ঞান ,দর্শন প্রভৃতি বিষয়ক স্থায়ী সাহিত্য রূপ ছড়াকে ভিত্তি করে গড়ে উঠতেই পারে। লেখক নলিনী বেরা তার কথাসাহিত্যে অজস্র ছড়ার ব্যবহার করেছেন। যেমন -

'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসের চরিত্র ফকিরচাঁদের মুখেই অজস্র ছড়া বসিয়েছেন। মুখে মুখে ছড়া কাটতে ওস্তাদ ব্যক্তি সে, মিলিয়ে মিশিয়ে বেশ কিছু ছড়া তৈরি করেছে। যেমন -

১। "কাঁথা বালিশ মশারি তিন নিয়ে ঘুসুড়ি।"[৪]

২। "ডাঁশ মশা মাছি তিন নিয়ে সাঁতরাগাছি।"[৫]

৩। "চোর জোচ্চোর ছ্যাঁচড়া তিন নিয়ে ব্যাঁটরা।"[৬]

৪। "খেঁটেল চেটেল ফড়ে তিন নিয়ে উলুবেড়ে।"[৭]

৫। "পাট চৈতি বাউল আর কথকতার সুর।
এই তিন নিয়েই খিলাবারুইপু।।"[৮]

৬। "দুলে কপালি মুচুরমান তিন নিয়ে বাগনান।"[৯]

এছাড়াও প্রথমবার ট্রাম চড়তে গিয়ে ফকিরচাঁদ সুন্দর ছড়া বেঁধেছে।

"ট্রাম শুধু ট্রাম নয়, ভালোবাসার ফুল
ট্রাম চড়ে ভাড়া দিতে করবে নিকো ভুল।"[১০]

দু'লাইনের সহজ সরল ভাষায় এক গভীর সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে এই উপন্যাসে।

'অপৌরুষেয়' উপন্যাসে শীতার্ত ভুঁড়া শিয়ালের উপস্থিতি দেখা যায়। কথিত আছে ভুঁড়াশিয়ালই খুব চতুর। শিয়াল আর শিয়ালের চতুরতা বোঝাতে লেখক একটি সুন্দর ছড়ার ব্যবহার করেছেন -

"সব শিয়ালকে ঠ্যাঙা ঠ্যাঙা,
ভুঁড়াশিয়ালকে তিন ঠ্যাঙা।।"[১১]

আবার, 'শবর চরিত' উপন্যাসেও একদল মেয়েমানুষ হই হই করতে করতে হুড়মুড় করে জঙ্গলে ঢোকে, আর মুখে তাদের একটাই ছড়া,

"বর-বরিয়াতি ছাগল আঁতি।
বরের মাকে লে'গেল তাঁতি।।"[১২]

এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র রাইবু। নরসিঙা তাদের বারবার খেদিয়ে দিত জঙ্গলে ঢুকলেই। গামবুট পায়ে তাদের কুঁড়েঘরে ঢিস ঢিস করে লাথি মারে, ভাতের হাড়ি কলসি ভেঙে দেয় কিন্তু সেই নরসিঙাকে কারা বুড়িয়ার ঘা মেরে রেখে যায়। অচৈতন্য নরসিঙাকে দেখে রাইবু মনে মনে একবার তার মৃত্যু চাইলেও পরক্ষণেই মন পরিবর্তন করেছে। মনে হয়েছে হাজার হোক মানুষতো আর মনে মনে বিড়বিড় করেছে পরিচিত ছড়ার দু'কলি -

"আংটি ভাঙে পিতল ভাঙ্গে সবই জুড়া যায়।
মানুষ মরিলে দাদা নাহ'গ জুড়া যায়।"[১৩]

এখানেই এই তথাকথিত শিক্ষিত না হয়েও প্রকৃত শিক্ষিতের মত আচরণ করেছে।

একইভাবে 'মাটির মৃদঙ্গ' উপন্যাসে লেখক অজস্র ছড়ার ব্যবহার করেছেন কিন্তু কখনই সেগুলিকে অপ্রাসঙ্গিক বলে আমাদের মনে হয়নি। বরং এই ছড়াগুলি ছাড়া উপন্যাসটাই যেন কেমন বেমানান বলে মনে হতো। এমন কিছু ছড়ার উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল -

"হাট তলাতে বড় কাদা।
তার পাশেতে হরি দাদা।।
হরি দাদার দর্জি।
তার চালাতে শুধু খড়।।
তার পাশেতে কুম্ভকার।
মাটি নিয়েই কারবার।।
কুজো কলসি ভাঁড় হাঁড়ি।
সারা উঠোনে সারি সারি।।
তৈরি হলেই হাঁটে যায়।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 176
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ঘরে এসেই ভাত খায়।।"[১৪] (পৃষ্ঠা ৩৪)

কুম্ভকার মানুষদের বাজারে যাওয়া এবং খাটা খাটনির পর ঘরে ফিরে প্রথমেই খেতে বসা, সে নিয়েই এই ছড়া। 'আশ পালনার' মাংস ভাত খেয়েছিল ভজহরি কুমহারের ছেলে। বস্তুত তার মারা যাওয়ার কথা কিন্তু সেই ছেলে দিব্যি বেঁচে বর্তে আছে এবং কিভাবে সেই ছেলেকে ভজহরি কুমহার বাঁচিয়েছিল সেই গল্প যখন সকলে শুনতে চাই তখন সে তাদের কাছে নুন লঙ্কা পেঁয়াজ সহযোগে এক থালা মুড়ি চেয়ে বসে এবং সেটা শেষ করে এক বিশেষ ভঙ্গিমায় ছড়া গেয়ে ওঠে-

"আম গাছে আম নেই ঢিল কেনে ছুঁড়ো হে।
তোমার দেশের আমি নই, আঁখি কেনে ঠারো হে।।"[১৫](পৃষ্ঠা ৪০)

আবার গ্রামের রামেশ্বর, ভন্ডি, শ্রীমন্ত, বসন্ত, বাণীকান্তদের মধ্যে বসন্তের ময়ূরভঞ্জ এর মুড়োডায় যাতায়াত আছে। সেই সূত্রে ওড়িয়া তার জানা, এমন কি বলতেও পারে। তাই মাঝে মাঝে সে হাসতে হাসতে এই ওড়িয়া ছড়া কাটে -

"শীল ছতু মেঘ বরষিলে কেতে ফুটন্তি
গোদরা খড়ে যেতে মাড়ে সেতে।
আরে ঢ্যামনা বুলিবালি আসি সেই আগোনা
এহি কি এতে মুদি নাহি গোড় কড়ার খেতে।।"[১৬] (পৃষ্ঠা ৮৯)

অর্থাৎ মেঘ বর্ষণ হলে কত ছত্রাক বা মাশরুম ফোঁটে, গোদওয়ালা মানুষ খুঁড়িয়ে যেতে তা মাড়িয়ে যায় আর ঢ্যামনা লো ক সেইখানে বেড়াতে এসে পা না মুড়েই আছাড় খায়।

গল্পের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয়নি। নলিনী বেরা গল্পে যেন একটু গল্প কম বলেন, আসলে বর্ণনা দিতে ছবি আঁকতে তিনি কার্পণ্য করেননি। তাই ঘটনার ঘনঘটা নেই। সেই ছবি, সংস্কৃতি ও উৎসবের 'ডিটেইলিং' তিনি এতখানি পরিমিতিবোধ দিয়ে নিখুঁতভাবে করেছেন যে নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি না করলে তা সম্ভব হয় না। এমনভাবে চরিত্রের সঙ্গে মিশিয়ে গল্পে শৈল্পিক ব্যবহার করতে পারতেন না, এত সহজ ভাবে এগুলি করেছেন যে সেই উপাদান আলোচনা না করলে গল্পের অনেকখানি বাদ পড়ে যায়। যেমন – 'বর্ষামঙ্গল' গল্পটি একটি অন্যরকম বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। জীবনের সঙ্গে যেমন মিলেছে বিশ্বাস ও সংস্কার তেমনি চরিত্র নির্মাণে মিলেছে আবেগ তারই প্রকাশ –

"খরা দিচ্ছে মেঘ দিচ্ছে খেঁকশিয়ালের বেহা হচ্ছে।"[১৭]

আবার 'ঘোড়া ও সর্ষেদানা' গল্পে শ্রাবণসংক্রান্তির দিন সন্ধ্যাবেলা ঝাঁপানের 'বারি' উঠবে। ওই নিয়ে দিবাকর হেঁটে যাবে। তার সামনে 'সাখী' বলতে বলতে হেঁটে যাবে তার পাঠ শিষ্যরা। চাপান-উতোর চলবে। প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তবেই 'বারি' নিয়ে যেতে পারবে। সেখানেও রয়েছে ছড়ার অস্তিত্ব -

"শুনো শুনো গুনীভাই করি নিবেদন।
গণেশের গজ মুন্ড কিসের কারণ।।
মনসার পদে মোর অসংখ্য প্রণাম ।
সাখীর জবাব দিয়ে চালাও ঝাপান।।"[১৮]

'বড়ভাজা, কটাচোখ ও বঙ্কিম বধূকের গল্প'তে লেখক পরভা বিশোই-এর কাহিনী বলেছেন বন্ধুদের। লেখকের দেখা পরভার সঙ্গে বর্তমান পরভার অনেক তফাৎ। এখন সে থুত্থুরি বুড়ি, যে বঙ্কিমকে পরভা কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে সেই বঙ্কিমই ডাইনি সন্দেহে পরভাকে মেরে ধরে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছে। কথক পরভাকে যখন দেখতেযান তখন পরভা ভাবে বঙ্কিম এসেছে কিন্তু কথককে দেখে অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়ার আগেই তার মন ভোলানোর জন্য কথক বলে উঠেছেন-

"পরভা রে পরভা
কী তরকারি রাধবা?
যৌ ফলটার ডাঁটি নাই
সৌ ফলটা রাধবা।"[১৯]

যে ছড়া একসময় পরভাকে রাগানোর জন্য তৈরি হয়েছিল আজ আর সেই ছড়া শুনে পরভার রাগ হয় না, আসলে এমন দ্বিমুখী ভাবে ছড়ার ব্যবহার কোনো গল্পকার করেছেন কিনা সন্দেহ আছে। কারণ যে জীবনকে আশ্রয় করে লেখক উপন্যাস ও গল্প বলেছেন সে জীবনে এমন সব ছড়া ভরে আছে, সেগুলিকে কখনোই আমাদের অতিরিক্ত বলে মনে হয় না। প্রতিবেশ রচনা করে যাওয়াই নলিনীর কাজ তারপর শেষে সামান্য মোচড় বা আঁচড় এবং আশ্চর্য পরিণতি। এই ছড়ার ব্যবহার লেখকের ভাষা বৈচিত্র্যকে আরো দৃঢ়তা দান করেছে।

গ্রাম্য মানুষগুলির দুঃখ বেদনা আনন্দ সবকিছুর সঙ্গেই ছড়ার একটা সম্পৃক্ত সম্পর্ক রয়েছে। লেখক তাঁর সাহিত্যে নানা ঢঙের ছড়া প্রয়োগ করেছেন। আশ্চর্যজনকভাবে প্রত্যেকটি ছড়াই যথাযথ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। কোনটাই আরোপিত বলে মনে হয় না। গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে চলা এই সমস্ত ছড়া।

লোককথা ও মিথকথা : লোককথা মৌখিক সাহিত্য। অতিরিক্ত রোমাঙ্গধর্মী কল্পনার স্বপ্নরাজ্যে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায় এই মিথকথা বা লোককথা। এতে মানুষের মনের চিরন্তন বিষয় ও সৌন্দর্য পিপাসা, ভয়ংকরকে জয় করার মনবল প্রকাশ পেয়েছে। সারা বিশ্ব জুড়ে একে অপরিণতমনস্ক শিশু মনের আস্বাদ্য বলে মনে করা হয় এগুলিকে। যদিও এমন ধারণার যথার্থ কোন ভিত্তি নেই। রূপকথাতে পরিণত বয়স্কের মানবাসনার সরল প্রতিফলনও দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ বাঞ্ছিত ব্যক্তি ও বস্তুকে লাভ করার তীব্র বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বহু বাধা বিঘ্ন ও ভয়কে অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা পায় এতে পরিণত মনের ছায়ায় পড়েছে। এই সাহিত্য একটি বিশেষ কালে উদ্ভূত হয়েও বাতাসের মতোই প্রবাহিত হয়েছে এ কাল থেকে সেকালে।

'মাটির মৃদঙ্গ' উপন্যাসে নিম্ন বুনিয়াদি টিচার সতীশ কুম্‌হার এম এ ই মাইনর এডুকেশন, ক্লাস সিক্স পাস, তার কাছে 'ঠাকুরমার ঝুলি' থাকতে পারে বলে কথক জানিয়েছেন আর সেখানেই থাকতে পারে পাতাল কন্যা 'মনিমালার গল্প'।

> "অনেক রাত্রে রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্র কি জানি কিসের এক ভয়ংকর শব্দ শুনিয়া জাগিয়া দেখেন, - বনম আলো! সেই আলোতে ওরে বাপরে বাপ্! রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্রের গা-অঙ্গ ডোল হইল, গায়ে পায়ে কাঁটা দিল, দেখেন, - আকাশ পাতলে গলা ঠেকাইয়া এক অজগর তাহাদের ঘোড়া দুইটাকে আস্ত, আস্ত গিলিয়া খাইতেছে! অজগরের মুখে ঘোড়া ছট্‌ফট্ করিতেছে! দেখিতে দেখিতে ঘোড়া দুইটাকে গিলিয়া, যতদূর আলোকে দেখা যায়, অজগার বনের পোকা মাকড় খাইতে খাইতে ততদুর বেড়াইতে লাগিল। রাজপুত্র থর্ থর্ কাপেন! মন্ত্রীপুত্র চুপিচুপি বলিলেন- বন্ধু ডরাইও না। ওই যে আলো, ওটি সাত রাজার ধন ফণীর মনি নিতে হইবে।"[২০]

আবার গ্রামে গঞ্জে শীত পড়ব পড়ব মরশুমে মাঠে ঘাটে যখন অল্প শিরশিরানি হাওয়া দেয় তখন এক জায়গায় লোক জটলা হয়ে পোআনের হাঁ-মুখের আগুনের উত্তাপ নেয়। শুরু হয় গল্প। আর এ প্রসঙ্গেই ওড়িশা থেকে আগত ভাই- বোনের প্রসঙ্গ উঠে আসে। যে কিনা বলেছে - "ভাই আমি যে মনিষকু বাহা হেবি সে হেব তুমর পরি ভল - অ ও সুন্দর- ও।" ঠিক এই প্রসঙ্গে সঠিক সময়ে বিষয়ের পারম্পর্য রক্ষা করে সুরেন্দ্রর মুখ দিয়ে লেখক বলিয়ে নিয়েছেন রাজার ছেলের শেওড়া গাছকে বিয়ে করার গল্প 'শাহাড়া সুন্দরীর গল্প'। এই শেওড়া সুন্দরীর গল্প লেখকের একাধিক উপন্যাস ও গল্পে উঠে এসেছে।

> "এক দেশে এক রাজা ছিলেন। রাজার এক রানী। তাঁর এক ছেলে দুই মেয়ে। ছেলের নাম 'অশোক' আর মেয়ের নাম 'দুলেই ফুলই'। একদিন অশোক শিকার করতে গিয়েছিল। কিন্তু শিকার না পেয়ে ফিরে আসছিল। ফিরে আসার রাস্তার ধারে একটা শেওড়া গাছ ছিল। সে দেখল যে সেই শ্যাওড়া গাছের মাথায় একজন মেয়ে চুল শুকোচ্ছে। চুল তার বার হাত লম্বা! তার রূপ দেখে সে মোহিত হল। মনে মনে ঠিক করল যে সে একেই বিয়ে করবে। এই ভেবে সে ঘরে চলে এল। ঘরের ভিতরে ঢুকে মুখ চেপে শুয়ে থাকল। অশোক যখন ঘরে এল তখন এক বিড়াল ছান ছাড়া তাকে আর কেউ দেখেনি। সন্ধ্যে হয়ে গেল তবুও অশোক ফিরল না দেখে তাকে খুঁজে আনতে রাজা রানী চার ধারে লোক পাঠালেন। কিন্তু তাকে খুঁজে পেল না। তখন 'হা অশোক' 'হা অশোক' রাজা রানী কাঁদতে লাগলেন।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 176
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তখন যে বিড়ালটা অশোককে ফিরে আসতে দেখেছিল সে রাজা রানীকে বলল বাটি করে দুধ-ভাত দিলে অশোকের খবর বলে দেব। রানী বললেন তুই তো প্রতিদিন দুধভাত খাস তাতেও হচ্ছে না। না মাসি আমাকে তো প্রতিদিন এটো উচ্ছিষ্ট দুধভাত খেতে দাও। আজ আমাকে দিতে হবে ভালো দুধ ভাত। রানী তখন বিড়ালকে ভালো দুধভাত খেতে দিলেন। দুধভাত খেয়ে সাত কপাট খুলে বিড়াল তো দেখিয়ে দিল অশোককে। কেন রে অশোক গোমড়া মুখ করে শুয়ে আছিস? 'না আমি একটা শ্যাওড়া গাছকে বিয়ে করবো'। রাজা রানী বললেন কি বললি? তুই রাজপুত্র তোর সঙ্গে অন্য রাজ্যের রাজকন্যার কোথায় বিয়ে হবে তা নয় সামান্য শাওড়া গাছের সঙ্গে বিয়ে এ কেমন কথা রে! ঠিক আছে তবে তাই কর রাজা কোন উপায়ান্তর না পেয়ে দিন ধার্য করে সেই শ্যাওড়া গাছটার সঙ্গেই বিয়ে দেবেন বলে ঠিক করলেন...।”[২১]

পোয়ানসালে কথকতার আসরে রাজপুত্র অশোকের সঙ্গে শ্যাওড়া গাছের বিয়ের আয়োজন চলছিল ভেরি তুরি বাজনা শাক বাজিয়ে। এই কথকতার আসর প্রান্তিক মানুষগুলির একটি সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। সেই সঙ্গে এই গল্প আমাদের একটি বিষয় বুঝিয়ে দেয় যে, মনে প্রেম এলে তা কোন বাঁধা মানে না আর সকলেরই একটি দিনের জন্য হলেও ভালো করে বাঁচতে ইচ্ছে করে। কুম্ভকারদের মধ্যে কাজের সময়ে গাঁজা খাওয়ার চল ছিল। গাঁজা না খেলে কুমহ্যর কারিগরদের নাকি হাত সরে না। তেমনি একদিনে গাজার কলকে হাতে বঙ্কিম বধূক শুরু করল 'করঞ্জির গল্প'। যদিও গল্প সোনার ধৈর্য সকলের ছিল না সেজন্য বঙ্কিম তাড়াহুড়ো করেই গল্পটি শেষ করল। এই গল্পের পরিণতি খুব দুঃখের এবং করুণ সুরের। এছাড়াও আমরা বরজিয়া কন্যা ভ্রমরের প্রেম কাহিনী শুনতে পাই। যা 'ভ্রমরগড়ের কাহিনী' রূপে পরিচিত। বরজিয়া কন্যা ভ্রমরের রূপে মুগ্ধ রাজপুত্র কিন্তু এই অসম বিবাহ হওয়ার নয়। ভ্রমরকে না পেয়ে রাজকুমার বরজিয়াদের এলাকায় আগুন ধরিয়ে দেয়। যে আগুনে সব পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

'ব্যাং কৌমুদী' গল্পের বুড়ি পিসিমা ছোটবেলায় মায়ের কাছে শুনেছিল মেঘ পাতালের ব্যাঙ মায়ের গল্প। ছেলেরা ব্যাঙ মারতে গেলে তাদেরকে ভয় দেখিয়ে এসব গল্প তিনি বলতেন। আকাশের বিদ্যুৎ চমকানি বাজ পড়া সবই নাকি সেই ব্যাঙ মায়ের কীর্তি। এই ব্যাঙ মায়ের গল্প 'কোলা সুন্দরীর গল্প' নামেও পরিচিত।

নলিনী বেরার 'মাটির মৃদঙ্গ' গল্পে উঠে এসেছে চির পরিচিত 'বেগুনবতী কন্যার' গল্প। বেগুনী রঙের শাড়ি আর কুচবরণ দেহে মেঘ বরণ চুল তার। তার চুলের দৈর্ঘ্য বারো হাত। একদিন সে চুল খুলে স্নান করতে গিয়ে একটা চুল খসে পড়ে নদীর জলে। ভাসতে ভাসতে চুল গিয়ে পৌঁছায় রাজার ছেলে বরুণ কুমারের ঘাটে। এত বড় চুল যার সে দেখতেই না কত সুন্দরী একথা ভেবে রাজার ছেলের ঘুম উড়ে যায়। আর সেই কন্যাকে পাওয়ার জন্য রাজার বেটার কান্না থামে না। মন্ত্রীর ছেলে ঘোড়া ছুটায় বেগুনবতী কন্যার সন্ধানে। এইভাবে রূপকথার গল্প ছুটতে থাকে এ প্রান্তর থেকে ও প্রান্তরে এক কাহিনীর সাথে যুক্ত হয় আর এক কাহিনী।

কুম্ভকার সমাজের জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে ব্রক্ষ্মবৈবর্ত পুরাণে থাকা শিব ও ভস্মাসুরের গল্প উল্লেখ আছে 'মাটির মৃদঙ্গ' গল্পে। আবার 'ঝিঙাফুল কাঁকুড়ফুল' গল্পে করম দেবতার লোককথা বর্ণিত আছে। করম ও ধরম দুই ভাই। দুই ভাইয়ের মধ্যে অমিল অনেক। এক ভাই ধর্মকথা নিয়ে থাকে, আর এক ভাই ব্যবসা বাণিজ্য করে। একদিন বাণিজ্য শেষে বাড়ি ফিরে করম ডাল পুঁতে করম রাজার পূজা করতে লাগলো। চাষবাস ছেড়ে হাড়িয়া খেয়ে নাচছে দেখে ধরম রেগে গিয়ে সেই ডাল উপড়ে ফেলে দেয়। থেমে যায় ধামসা মাদলের শব্দ। ঘন অন্ধকারে ভেসে আসে শুধুই কান্নার শব্দ। এরপর করম রাজাকে খুঁজতে তারা দুই ভাই পাড়ি দেয় সাত সমুদ্র তের নদী পার। করম দেবতাকে আবার ফিরিয়ে এনে পুজো করে। এভাবেই লেখক এই গল্পের বর্ণনা দিয়েছেন।

মিথ মূলত ঐতিহ্যবাহী, প্রাচীন কালের কাহিনী। এ কাহিনীতে প্রকাশ পায় জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানুষের মৌলিক ধারণা, মন মানসিকতার স্বরূপ, রীতি-নীতি-প্রথা বা সমাজের আদর্শ। প্রাক-শিক্ষিত সমাজের সত্য ঘটনা রূপে মেনে নেওয়া তাদের পূর্বকালের আদি মানবদের কাহিনীকে বলা হয় মিথ। কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বা ঘটনা সম্পর্কে গড়ে ওঠা লোকোবিশ্বাসও মিথ। যেমন - রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়। কাল্পনিক বা

অপ্রমানিত কাহিনী, ব্যক্তি বা বস্তুও মিথ। যেমন হাট্টিমাটিম টিম, বনলতা সেন। আসলে বিশ্ব প্রকৃতির যা কিছু দুর্বোধ্য তার অন্তরালে অলৌকিক শক্তির কল্পনা করতো আদিম মানুষ তাদের জীবন যাপনের জন্য অনিবার্য যেসব আচার বিধি পালিত হতো তারই সূত্র ধরে কালক্রমে গড়ে উঠেছিল গল্প। তাই পরিণত হয়েছে মিথে। একটি আঙ্কিক পদ্ধতি নিয়ে বলা যায় -

$$MYTH= D\ (S_1+S_2+S_3+S_{4...})$$

[D=Divinity, S=Story]

আসলে মিথ হল একটি বহমান গল্প বা বিশ্বাস। যা কাল থেকে কালান্তরে বদলে যায়। বদলায় বাইরের আবরণ। লেখক কখনো কখনো তা অবিকৃতভাবেই নিজের লেখনীতে তুলে ধরেন আবার কখনো তারই তুলির টানে তা নব কলেবরে পরিবেশিত হয়। যা অনেক বেশি নান্দনিক হয়ে ওঠে। লেখক নলিনী বেরা তার উপন্যাস ও গল্পের এমনই বহু মিথ ব্যবহার করেছেন। কখনো হুবহু ব্যবহার করেছেন আবার কখনো তার নবনির্মাণ ঘটিয়েছেন।

নলিনী বেরার 'ফুলকুসুমা' উপন্যাসে শ্রীশ্রী রামেশ্বরনাথ জীউর মন্দির নির্মাণ নিয়ে মিথকথার প্রচলন আছে। ফুলকুসুমা গ্রামের পশ্চিমে পাহাড়ের উপর শ্রীশ্রী রামেশ্বরনাথ জীউর মন্দির। নয়াগ্রাম পরগনার সুবর্ণরেখা নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত, সম্পূর্ণ উৎকলীয় ধাঁচে নির্মিত, উচ্চতায় যা প্রায় ৭৬ ফুট। কিন্তু এত উচ্চ মন্দির অনেকদিন ধরে তৈরি হয়নি, তৈরি হয়েছে একদিনের এক রাত্রিতে। গ্রামের কর্মক্লান্ত মানুষ রাতের খাওয়া খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে এক অলৌকিক কারিগর নিদারুণ ক্ষিপ্রতায় মন্দিরের নির্মাণ কার্য শুরু করে এবং মন্দির সম্পূর্ণ হওয়ার মুখে হাতের কাজ থামিয়ে দেয়। কারণ সবাই শুনে আসছে -

> "মন্দিরের অদূরবর্তী বনডুংরির ওধারে কিয়াঝরিয়া গ্রামে শেষরাতে ঘুম থেকে জেগে ওঠা চিড়াকুটি রমণীর চিড়ে কুটবার উদ্দেশ্যে ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া, ঢেঁকির 'আঁকুর দুম হুঁকুর দুম' শব্দ হওয়া। অসম্পূর্ণ মন্দির চত্বরে, চৌহদ্দিতে ইতস্তত পড়ে থাকা বড় বড় চাঁছাছোলা পাথরের থাম, ঢেকির পাড়ের শব্দ শুনে কারিগরের হাতের কাজ থামিয়ে দেওয়ার সাক্ষ্য এখনো বহন করছে।"[২২]

ফুলকুসুমার মানুষজন জ্ঞান হওয়া অবধি সবাই শুনে আসছে এই লোকবিশ্বাসে ঘেরা মিথের কথা।

তাঁর 'শবরচরিত' উপন্যাসে মিথ ও পুরাণচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। লোধাদের মধ্যে লোকশ্রুতি আছে যে তারা জরাশবরের বংশধর, ব্রাহ্মণের থেকেও বড়। ভগবান স্বয়ং একবার পা ঝুলিয়ে গাছে বসে ছিলেন। পদ্মফুলের মতো রাঙা দুটি পা। জরাশবর 'মিরগির কান' ভেবে কাঁড় ছেড়ে দেয়। সেই কাঁড়ে ভগবান মারা যায়। ভগবান মারা যাবার পূর্বে বলে যান –

> "জরা রে তুই বেড়ে পুণ্যিমান, এবার থিক্যে তোর জাত হবে বেরান্তণের থিক্যেও বড়।"[২৩]

লোধারা চাষবাস করে না। তাদের বিশ্বাস শিবঠাকুরের অভিশাপে তারা চাষবাস থেকে বঞ্চিত। লোধাদের চাষবাস শিখাতে প্রথমে শিবঠাকুর গরু-হাল দিল। জঙ্গল কেটে চাষের জমি তৈরি করতে বলল। জঙ্গল কাটতে কাটতে লোধারা ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে হালের বলদটাকেই কেটে খেয়ে ফেলে। হাতির কানের মতো সেগুন পাতায় করে খেয়ে নেয়। সেই থেকে তাদের বিশ্বাস-'সেগুনের ডগ ভাঙলেও রক্তের পারা রস গড়ায়। শিবঠাকুর রুষ্ট হয় এবং অভিশাপ দেয় -

> "যাকে দিয়ে চাষবাস করবি, তাকেই কী না কেটে খেয়ে ফেললি! হায় হায়রে বোকার জাত। রাগে কাঁই শিবঠাকুর তেখন অভিশাপ দিল, বনে জঙ্গলেই ঘুরে ঘুরে মরবি তোরা। তোদের কপালে চাষবাস নাই।"[২৪]

এমনিতেই শবরদের জঙ্গল আবাসের অনেক কিছুই রামায়ণের নামচিহ্ন বহন করছে। জঙ্গলের নাম তপোবন, নালার নাম সীতানালা। অশ্বমেধের ঘোড়াধরা, লবকুশের গল্প জানে জঙ্গলমহলের মানুষ। তাদের কোন চরিত্রের নাম বিন্দাদূতী, কোন চরিত্র সুরথ। পুরাণকে বদলেও নিতে জানে লোকপুরাণের বেশে। তাদের পূর্বপুরুষ জরা শবরের কাহিনি আর ললিতাপালার কাহিনি তাদের অস্তিত্বের ঐতিহাসিক বাস্তবতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আজও।

> "বসুশ্রবা-র পালিতা কন্যা ললিতা আসলে এক ব্রাহ্মণের মেয়ে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিদ্যাকে পাঠিয়েছিল বসুশ্রবার আরাধ্য কালিয়া দ্যাবতাকে চুরি করে আনতে। ব্রাহ্মণ-যুবক বিদ্যা বৃদ্ধের ছদ্মবেশে বসু শবরের

> ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। সুযোগ বুঝে একদিন কালিয়া দ্যাবতাকে চুরি করে ললিতাকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যা চলে গেল। সুতরাং বিদ্যা দ্বিজবর তো আসলে লোধাদের জামাই। সুতরাং লোধারা ব্রাহ্মণদের গড় করে না এবং লোধারা বেরাহ্মণের চেয়েও বড়।"[২৫]

এইভাবে লক্ষ্য করা যায়, আঞ্চলিক প্রায় প্রতিটি জনগোষ্ঠীর জীবনে কোন না কোন ঘটনা বা কাহিনি রয়েছে যা তারা মিথ আকারে বহন করে চলেছে। আবার পুরাণের ঘটনাকেও তারা তাদের মতো করে ভেঙে-গড়ে নতুন এক লোকপুরাণের সৃষ্টি করেছে। যা তাদের বিশ্বাস-সংস্কার ও আশা-আকাঙ্খার মধ্যে জাগ্রত হয়ে আছে।

একইভাবে লক্ষ্যণীয়, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সুবর্ণরেখা নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর অঞ্চলের মানুষদের জীবন, সংস্কৃতি ও ভাষা কথাসাহিত্যে তুলে ধরার কৃতিত্ব অবশ্যই নলিনী বেরার এবার আসা যাক গল্পের প্রসঙ্গে। মহাভারতের কর্ণের রথচক্র মাটিতে বসে যাওয়ার মতো ভয়াভহ অবস্থা হয়েছিল 'কহবর লেখ' গল্পের শশাঙ্কর। গাড়ির চাকা নদীর বালিতে বসে যাওয়াতে তার যে অসহায় অবস্থা হয়েছিল তার সঙ্গে মহাভারতের মিথটি মিলে যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে সন্তানহারা গান্ধারী অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে সমস্ত দুর্ভগ্যের জন্য দায়ী করে। ঠিক তেমনি ভাবেই 'পুষ্করা' গল্পে সন্তানহারা ন'কাকি মেজো কাকার কাছে তাঁর দুঃখ, বেদনা সমস্ত যন্ত্রণাকে উগরে দেয়, -

> "আলুলায়িত কুন্তল, একটা হাত একটা আঙুল সামনে প্রসারিত, উদিষ্ট অবিকল গান্ধারীর ভঙ্গিমায় ন'কাকি একধারসে ঠুকে যাচ্ছে, ঠুকে যাচ্ছে।"[২৬]

'মাটির মৃদঙ্গ' গল্পে দাদা-সুহাগী বোন বিয়ের জন্য ঠিক তার দাদার মতো পাত্র নির্বাচন করতে চায়, তখন কুম্ভকার সমাজের কেউ কেউ ব্যপারটি কলিযুগের উল্টাপুরাণ মিথটি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে একশ পঁচিশ বিঘার চর জেগে ওঠে, যার নাম 'বৈশাখী পাল'। বহুবছর পূর্বে চরের ভোগদখল নিয়ে শুরু হয়েছিল জমিদার ও মানুষের লড়াই। যুদ্ধে মারা গিয়েছিল বহু সাধারণ মানুষ। সেই নিয়ে লেখা হয়েছিল আখ্যান, পালা গান –

> "বিধি যাহা লিখি আছে কপালে। বৈশাখীপালে গো বৈশাখী পালে।"[২৭]

এসব কথা আজও মিথ, পুরাণ আর ইতিহাসে মিলেমিশে পরিবেশিত হয়। গল্পের আসরে বৈশাখী পালের প্রসঙ্গ ওঠে;

> "মহা প্লাবনের পরে পরে ভগবান বিষ্ণুই ত বরাহের রূপ ধরে জলের তলা থেকে ধরাকে দাঁতে করে তুলে এনেছিলেন জলের উপর। তেমনি সেবার সেই বৈশাখে প্রচণ্ড খরা, মাঠঘাট ফুটিফাটা, যেন প্রলয়ঙ্কর সূর্যের সাত রং সাত রশ্মি শোষণ করে নিয়েছে নদীনালা-খাল-বিলের জল, প্রলয়ের সময় যেমনটা ঘটে আর কী! যেন একটা নয়, এক সঙ্গে সাতটা সূর্য শোষণ করে চলেছে, ধরাকে দগ্ধাচ্ছে, মাঠঘাট জমিজোতের চেহারা হয়ে দাঁড়িয়েছে কাছিমের পিঠের মতো ফাটাফুটো, যেন ভগবান বিষ্ণুরই 'কুর্ম্মা অবতার', অবশেষে সেই বৈশাখেই সুবর্ণরেখার উৎসে বৃষ্টি নামল; বৃষ্টি বৃষ্টি, ধুলমাদুল অঝোরঝর বৃষ্টি।"[২৮]

এরপর মহাপ্রলয় উপস্থিত। সে সময় বরাহরুপী ভগবান বিষ্ণু দাঁতে করে পলি এনে সুবর্ণরেখার উপর স্থাপন করেছিল। সেই থেকেই নাম হয় 'বৈশাখী চর' বা 'বৈশাখী পাল'।

এভাবেই লেখক লোকভাষা, ছড়া, মিথের মাধ্যমে ছবির পরে ছবি এঁকে গেছেন। যে ছবি আমাদের প্রান্তিক মানুষের এবং সেই অঞ্চলের ভাষাকে ড্রয়িংরুমে এনে হাজির করেছে। বুঝতে শিখিয়েছে তাদের অনুভূতিগুলিকে।

Reference:

১. লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা, ২, ৩, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ১৬০
২. বেরা, নলিনী, 'ফুলকুসুমা', করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা- ৯, প্রথম সংস্করণ, ২০০৭, পৃষ্ঠা - ১৪
৩. বেরা, নলিনী, 'শবর চরিত', করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা- ৯, তৃতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা - ১৪৯
৪. বেরা, নলিনী, 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা', দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা- ৭৩, প্রথম সংস্করণ ২০১৪, পৃষ্ঠা - ৯৬
৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ৯৬
৬. তদেব, পৃষ্ঠা - ৯৬

৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ৯৪
৮. তদেব, পৃষ্ঠা - ৯৫
৯. তদেব, পৃষ্ঠা - ৯৫
১০. তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৭
১১. বেরা, নলিনী, ‘অপৌরুষেয়’, দে’জ পাবলিশিং , কোলকাতা- ৭৩, প্রথম মুদ্রণ ২০০৭, পৃষ্ঠা - ৮২
১২. বেরা, নলিনী, ‘শবর চরিত’, করুণা প্রকাশনী , কোলকাতা- ৯, তৃতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা - ৪৪
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৭১
১৪. বেরা, নলিনী, ‘মাটির মৃদঙ্গ’, দে’জ পাবলিশিং , কোলকাতা- ৭৩, প্রথম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৭, পৃষ্ঠা - ৩৪
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪০
১৬. তদেব, পৃষ্ঠা - ৮৯
১৭. বেরা, নলিনী, ‘বর্ষামঙ্গল’, ‘পঞ্চাশটি গল্প’, করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃষ্ঠা - ১৮
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা - ৩১
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৬২
২০. বেরা, নলিনী, ‘মাটির মৃদঙ্গ’, দে’জ পাবলিশিং, কোলকাতা- ৭৩, প্রথম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৭, পৃষ্ঠা - ১০৫
২১. তদেব, পৃষ্ঠা - ২১
২২. বেরা, নলিনী, ‘ফুলকুসুমা’, করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা- ৯, প্রথম সংস্করণ, ২০০৭, পৃষ্ঠা - ১৫
২৩. বেরা, নলিনী, ‘শবর চরিত’, করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা- ৯, তৃতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা - ৩২
২৪. তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৩
২৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৮
২৬. বেরা, নলিনী, ‘পুষ্করা’, ‘পঞ্চাশটি গল্প’, করুণা প্রকাশনী , কোলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃষ্ঠা - ৮৭
২৭. বেরা, নলিনী, “যে জীবন ‘মিথে’র, যে ‘মিথ’ জীবনের’, ‘উঠিলা সুয়ারী বসিলা নাহি’, দে’জ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃষ্ঠা-৯
২৮. তদেব, পৃষ্ঠা - ১২

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

বেরা, নলিনী, ‘সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা’, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা-৭৩, দে’জ পাবলিশিং, সেপ্টেম্বর ২০১৯
বেরা, নলিনী, ‘দুই ভুবন’, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা-৭৩, দে’জ পাবলিশিং ২০০৫
বেরা, নলিনী, ‘শবর চরিত’, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা-৯, করুণা প্রকাশনী ২০১৭
বেরা, নলিনী, ‘অপৌরুষেয়’, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা-৭৩, দে’জ পাবলিশিং, ২০০৭
বেরা, নলিনী, ‘কুসুমতলা’, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা-৭৩, দে’জ পাবলিশিং, ২০০৮
বেরা, নলিনী, ‘পঞ্চাশটি গল্প’, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা-৯, করুণা প্রকাশনী, ২০১১
বেরা, নলিনী, ‘সেরা পঞ্চাশটি গল্প’, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা-৭৩, দে’জ পাবলিশিং, ২০১৫
বেরা, নলিনী, ‘মাটির মৃদঙ্গ’, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা-৭৩, দে’জ পাবলিশিং, ২০১৭
বেরা, নলিনী, ‘চোদ্দমাদল’, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা-৭৩, দে’জ পাবলিশিং, ২০০৩
বেরা, নলিনী, ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা-৭৩, দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৪
বেরা, নলিনী, ‘ফুলকুসুমা’, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা-৯, করুণা প্রকাশনী, বইমেলা ২০০৭

সহায়ক গ্রন্থ :

মণ্ডল, দীনবন্ধু, 'সত্তর উত্তর বাংলা উপন্যাসে অন্ত্যজ জীবন', প্রথম সংস্করণ, কলকাতা-৯ আশাদীপ ২০১৫
চক্রবর্তী, সুধীর, 'সাহিত্যের লোকায়ত পাঠ', প্রথম সংস্করণ, কলকাতা-৯, পত্রলেখা ২০১৩
মজুমদার, অভিজিৎ, 'শৈলী বিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্য তত্ব', তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা- ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭
কেরকেটা, হেমলতা, 'বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী জীবন', প্রথম সংস্করণ,কলকাতা-৯, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ-২০২০
সরকার, সুনীতি, 'নলিনী বেরার উপন্যাস প্রান্তবাসীর বিশ্বায়ন', প্রথম সংস্করণ, কলকাতা- ৯, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০২৫

পত্র-পত্রিকা :

কর্মকার, লক্ষ্মণ (সম্পাদিত), 'সৃজন: নলিনী বেরা বিশেষ সংখ্যা', ভলিউম ২৭, পশ্চিম মেদিনীপুর – ৭২১২১২, নভেম্বর ২০১৯
কর্মকার, লক্ষ্মণ (সম্পাদিত), 'সৃজন: ছোটগল্প বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা', ভলিউম ২৬, পশ্চিম মেদিনীপুর – ৭২১২১২, আগস্ট ২০১৯
মিদ্যা, দুর্গাদাস (সম্পাদিত), আরাত্রিক বইমেলা সংখ্যা, 'ক্রোড়পত্র; নলিনী বেরা', কলকাতা-৮, জানুয়ারি ২০২০
ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত), 'লেখালেখির অন্তর্কথন', কোরক সংকলন, কলকাতা-৫৯, বইমেলা ২০২৪